হাতি মানুষের দ্বন্দ্ব নিরসন ও বন্যহাতি সংরক্ষণ

শুভব্রত সরকার || ড. মোঃ সাইফুর রহমান

২০২৫ এর ২০ মার্চ, বন্য হাতির পাল এসেছে নালিতাবাড়ীর মধুটিলা এলাকার জঙ্গলে। এই মধুটিলা এলাকার পূর্ব সমুশ্চুড়া গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউল হক। পেশায় কৃষক, করেন ধান চাষ। সমুশ্চুড়া গ্রামের পাহাড়ের ঢালের নিচু জলাভূমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছেন। এলাকার পাহাড় জঙ্গলে বুনো হাতির পাল আসার খবর শুনে ফসল রক্ষার জন্য জমির চারপাশে জিআই তার দিয়ে ঘেরাও দিয়ে দিলেন তিনি। অতঃপর জেনারেটরের সাথে সংযোগ দিয়ে বানিয়ে ফেললেন উচ্চ ভোল্টেজের ইলেকট্রিক ফেন্সিং। রাত ১০ টা নাগাদ খাবারের খোঁজে বুনো হাতির দল টিলা ও জঙ্গল থেকে বের হয়ে নেমে আসলো সমতলের দিকে। সে সময়ে সমুশ্চুড়া গ্রামের পাহাড়ের ঢালে জিয়াউল হকের পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে মারা পড়লো একটি হাতি। পরদিন খবর পেয়ে "বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, শেরপুর" এর বিভাগীয় রেঞ্জ কর্মকর্তার মামলায় পুলিশ জিয়াউল হককে গ্রেফতার করে। জব্দ করা হয় জিআই তার ও জেনারেটর। এর আগে ২০২৪ এর অক্টোবরে নালিতাবাড়ীর বাতকুচি গ্রামে রাবার বাগানে, ২০২৩ এ শেরপুরের ঝিনাইগাতী ও অক্টোবর,২০২১ এ শ্রীবরদীতে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে হাতি মারার খবর পাওয়া যায়। এই সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব চলমান রয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ অঞ্চলের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিভাগের তথ্যানুসারে, হাতি মৃত্যুর সংখ্যা ৩৩টি এবং হাতির আক্রমণের ফলে ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জামালপুর জেলার গারো পাহাড় এলাকায় মানুষ মারা গেছে ৪৩ জন। এর মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ১০ জন, জামালপুর জেলায় তিনজন, নেত্রকোণা জেলায় পাঁচজন এবং শেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ ২৫ জন। অপরদিকে মানুষ কর্তৃক হাতি হত্যা হয়েছে জামালপুর জেলায় ৩টি, নেত্রকোণা জেলায় ২টি এবং সর্বোচ্চ শেরপুর জেলায় ২৭টি হাতি। চলতি বছর মার্চ মাসে একজন হাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে এবং এপ্রিল মাসে একজন আহত হয়েছে। এছাড়াও অন্য এক তথ্যসূত্র জানা যায়, গত ২৪ বছরে হাতি-মানুষের সংঘাতে হাতি মারা পড়েছে ৩০ টি ও ৩৫ জন মানুষ হাতির আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছে।ফলে, গারো পাহাড় এলাকায় হাতি-মানুষের সংঘাতে মৃত মানুষ ও হাতির সংখ্যা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে।

বন অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে, উক্ত তিনটি জেলায় বন অধিদপ্তরের বনভূমির পরিমাণ ১৭৪৮৩ দশমিক ৯৮ একর, ডিসি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত খাস জমি ৯৯১ দশমিক ৯৩ একর ও ভেস্টেড জমি ১৬১৪ দশমিক ৬৭ একর, এবং ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ ১৮৬৩ দশমিক ৪৬ একর। তন্মধ্যে বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু স্থানীয়দের বিশেষত গারো সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে প্রায় ১৭০০ একর। এক সময় গারো পাহাড়ের বিস্তীর্ণ শাল ও গজারি বনাঞ্চল ছিল হাতির অবাধ বিচরণভূমি। ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় হাতি ভারতের মেঘালয় থেকে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করে। এসব হাতিগুলি পরিযায়ী হাতি হওয়ায় অতীতে এদেশে আসত এবং ভারতে চলে যেত। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশে অবস্থান করে। আন্তঃদেশীয় হাতির মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ১২০-১৩০, তবে হার্ড (হাতির পাল) এর সংখ্যা ৪টি ।

এশিয়ান হাতি মূলত পাহাড়ি এলাকায় বিচরণ করে। বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ের অভ্যন্তরের ছড়াগুলোতে পানি এবং বনের অন্যান্য জায়গায় খাবার থাকার ফলে সেসময় হাতিগুলো পাহাড়েই অবস্থান করে। শুষ্ক মৌসুমে পাহাড়ের ঝিরির পানি শুকিয়ে যায় ও খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তখন এই পরিযায়ী হাতিগুলো খাবার ও পানির খোঁজে সমতলে নেমে আসে। ভারতে গারো পাহাড়ের যে অংশে বিভিন্ন শিল্প ও ফসল চাষ যেমন-কাজুবাদাম আবাদ করার ফলে সে অংশে বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে হাতির প্রাকৃতিক বাসস্থান নষ্ট হয়েছে। এছাড়াও পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে রক সল্ট নামক খনিজের অতি আহরণের ফলে হাতির প্রাকৃতিক লবণের উৎসগুলো নষ্ট হয়েছে। হাতির এই অস্বাভাবিক অভিবাসনের পেছনে অন্যতম কারণ হলো বন উজাড় ও পাহাড়ি এলাকায় বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি। সময়ের সঙ্গে বনভূমি দখল ও কৃষিজমিতে রূপান্তরের ফলে হাতির স্বাভাবিক বাসস্থান সংকুচিত হয়ে পড়েছে। শেরপুরের সীমান্তবর্তী নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদী উপজেলায় গারো, কোচ, ডালু, বানাই ও হদি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। সময়ের সঙ্গে তাদের সংখ্যা বেড়েছে এবং অনেক জায়গায় বনভূমি দখল করে বসতি গড়ে তোলা হয়েছে। এতে বনাঞ্চল সংকুচিত হয়ে হাতির আবাসস্থল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

হাতির পাল সবসময় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে যাতায়াত করে। আগে তারা মেঘালয় থেকে এই পথগুলো ধরে বাংলাদেশে আসতো, কিছুদিন অবস্থান করে আবার ফিরে যেত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা পানির উৎস ধরে চলাচল করতো ও ঝিরিপথের ব্যবহার করত। কিন্তু, ২০১৯ সালের পর থেকে সীমানা পারাপারের গেটগুলো বন্ধ রাখা হয়। তারকাঁটার বেড়া স্থাপনের ফলে এখন ঝিরিপথগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। উপরন্তু, যখনই হাতিরা এই বেড়া পার হতে চেষ্টা করে, তখন গুলি করে বা ভয় দেখিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশের ভেতরে ঠেলে পাঠানো হয়। এর ফলে হাতিগুলো এখন বাংলাদেশের গারো পাহাড় অংশে আটকে পড়েছে। সেই থেকে বন্যহাতিগুলো শেরপুর সীমান্ত অঞ্চল নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদী উপজেলাসহ হালুয়াঘাটে বসবাস করে আসছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই অঞ্চলে যথেষ্ট বনভূমি নেই যা তাদের পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান দিতে পারে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই খাবারের খোঁজে তারা ফসলি জমি ও ফলের বাগানগুলোতে চলে আসছে। এমনকি খাদ্যের খোঁজে বন থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে আসছে। হাতির আক্রমণ ঠেকাতে স্থানীয় মানুষজন তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে, যেমন: আওয়াজ করে, ঢোল পিটিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে, পাথর নিক্ষেপ করে, বিদ্যুতায়িত করে হাতিকে তাড়ানোর চেষ্টা করে। ফসলের ক্ষতি ঠেকাতে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে হাতি তাড়ানোর প্রচেষ্টার কারণে সবচেয়ে বেশি হাতি মারা যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে স্থানীয়দের মাঝে হাতি তাড়ানোর জন্য পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে; যা স্থানীয়রা জেনারেটর চালানোর মাধ্যমে জিআই তারের বৈদ্যুতিক বেড়া তৈরি করে হাতি তাড়াতে ব্যবহার করেছে এবং এর ফলে সর্বোচ্চ সংখ্যক হাতির মৃত্যু ঘটেছে। "বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইন ২০১২ (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা)" মোতাবেক কোনো ব্যক্তি হাতি হত্যা করলে তিনি অপরাধ

করেছেন বলে গণ্য হবেন। এ অপরাধের জন্য জামিন অযোগ্য হবেন এবং তিনি সর্বনিম্ন ২ বছর এবং সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ১২ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

"বন্যপ্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমাল ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২০১০" অনুযায়ী বন্যপ্রাণী দ্বারা গবাদিপশু, ঘর-বাড়ি ও ফসল ইত্যাদি পরিসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রয়েছে। পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ মারা গেলে ১ এক লক্ষ টাকা ও পঙ্গু হলে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু জমির দলিল ও কাগজপত্র সম্পর্কিত নানা জটিলতার কারণে ক্ষতিপূরণের অর্থ যথাসময়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের হাতে পৌঁছায় না। ফলে, স্থানীয় জনগণের সাথে হাতির সংঘাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বনবিভাগের পক্ষ থেকে শেরপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবানের হাতি অধ্যুষিত এলাকায় মানুষ-হাতির দ্বন্দ্ব নিরসন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনসাধারণকে হাতি রক্ষার কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে এপর্যন্ত ১২০ টি ইআরটি (এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম) গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে ময়মনসিংহ বন বিভাগের উদ্যোগে শেরপুর জেলায় ২৩ টি ইআরটি গঠন করা হয়েছে। প্রতি কমিটিতে ১০ জন করে সদস্য রয়েছে। তারা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ও মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে কাজ করছেন।

হাতি-মানুষের সংঘাত নিরসনে সম্মিলিত ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। বন অধিদপ্তরের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ জনগণকে এই সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসতে হবে। হাতি-মানুষের সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে, হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগণের মধ্যে হাতির প্রতি ক্রোধ ও ভীতি দূরীকরণের জন্য, তাদের নিয়ে পরিবেশ ও বনভূমিতে হাতির গুরুত্ব, বনভূমির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন ও স্থানীয় জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও বন অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ব্যাপক প্রচারণা, জনসচেতনতামূলক সভা, ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। হাতির সুরক্ষার তাগিদে হাতি চলাচলের পথ, আবাসস্থল এবং কৃষিজমি থেকে জিআই তার অপসারণ এবং বিদ্যুতায়িত হয়ে হাতির মৃত্যু প্রতিরোধে কৃষিজমি সংলগ্ন এলাকাগুলোতে বন বিভাগের উদ্যোগে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। হাতি রক্ষায় হাতির প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলো সুরক্ষিত করতে হবে। হাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি অনেকগুলো জলাভূমি রয়েছে যা বন বিভাগের আওতাধীন, সেগুলো আগে হাতি দ্বারা ব্যবহৃত হলেও এখন স্থানীয় মানুষজন অবৈধভাবে জলাভূমির চারপাশে জিআই তারের বৈদ্যুতিক বেড়া দিয়ে চাষাবাদ এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছেন যা হাতি-মানুষের সংঘাতের অন্য আরেকটি কারণ। কাজেই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই জলাভূমিগুলো উদ্ধার করা হলে হাতি-মানুষ সংঘাত সমাধানের পথ তৈরি হবে এবং হাতি যাতে নিরাপদে জলাধারগুলো ব্যবহার করতে পারে সেটি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

হাতি অধ্যুষিত পাহাড়ি এলাকা হতে জ্বালানি ও কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গাছ কাটা ও জংগল পরিষ্কার বন্ধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। হাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইআরটি(এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম) -কে কার্যকর করতে তুলতে হবে। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে জরুরি প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ, এবং সরকারি উদ্যোগে দৈনিক ভিত্তিতে ইআরটি (এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম) সদস্যদের মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রাণী চোরাচালান রোধে বন বিভাগের "বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট" এর তত্ত্বাবধানে "বর্ডার এরিয়া মনিটরিং টিম" গঠনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে হাতি চলাচলের করিডোর খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে হাতি-মানুষের সংঘাত অনেকটাই কমে আসবে বলে আশা করা যায়। হাতির আক্রমণে কৃষকদের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিধিমালা অনুযায়ী স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। হাতি অধ্যুষিত এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে হাতির আক্রমণে ফসলহানি রোধে ক্রপ প্যাটার্ন পরিবর্তনের কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

এই পৃথিবী সকল প্রাণীর আবাসস্থল। পৃথিবীর মাটি, পানি ও প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সকল প্রাণীর অধিকার রয়েছে। হাতি বনভূমির রক্ষক। বনভূমির স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে ও বনভূমির বিস্তার ঘটাতে হাতি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। মানুষের আগ্রাসনে ও নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংসের কারণে বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে নীলগাই, গন্ডার, ঘড়িয়ালসহ আরো অনেক প্রাণী প্রজাতি। হাতি, মেছোবিড়াল, বনবিড়াল, শুশুক, ভালুক, বেঙ্গল টাইগার, শজারুসহ আরো অসংখ্য প্রাণী প্রজাতি মহাবিপন্ন পর্যায়ে চলে গিয়েছে। আমরা চাই না হাতি-মানুষের সংঘাতে ভবিষ্যতে আর একটিও হাতি মারা পড়ুক বা আর একজনও মানুষ প্রাণ হারাক। অতি দ্রুত সকল সংকটের নিরসন হোক, মানুষ-বন্যপ্রাণীর সহাবস্থানে আমাদের দেশ সকল প্রাণীর সুন্দর আবাসস্থল হয়ে উঠুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

#

লেখক: শুভব্রত সরকার, পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক, সেভ ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড নেচার - (সোয়ান) ও

ড. মোঃ সাইফুর রহমান, যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

পিআইডি ফিচার